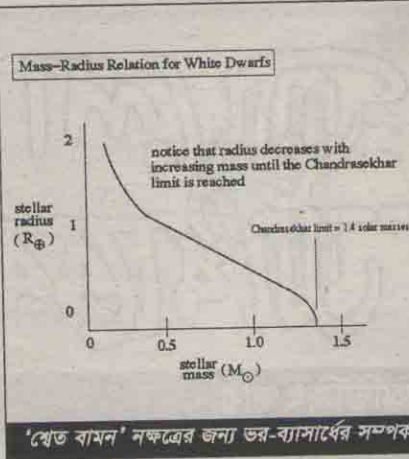


সাধারণ নক্ষত্রের ভর বাড়ার সাথে সাথে এটি আয়তনেও বাড়তে থাকে, কিন্তু শ্বেত বামনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ঠিক উল্টো। ভর বৃদ্ধির সাথে এটি আয়তনে না বেড়ে বরং আরও সঙ্কুচিত হতে থাকে। নীচের ছবিটি দেখলে হয়তো পাঠকদের কাছে ব্যাপারটি কিছুটা স্পষ্ট হবে। লক্ষণীয় যে, ভর বাড়তে বাড়তে এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যখন নক্ষত্রটির ব্যাসার্ধ (আয়তন) কমে আক্ষরিক অর্থে শূন্যে উপনীত হয়।

১৯৩০ সালের আগ পর্যন্ত অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, সব তারকাই বোধহয় এমনিভাবে শেষপর্যন্ত জ্বালানি নিঃশেষ করে শ্বেত বামনের রূপ নেয়। কিন্তু চন্দ্রশেখর যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে না, সব তারকা নয়, যে সকল তারার ভর সূর্যের ভরের ১.৪ গুণের বেশি, এরা কিন্তু কখনই এ ধরনের প্রক্রিয়ায় শ্বেত বামনে পরিণত হবে না। এটিই বিখ্যাত 'চন্দ্রশেখর সীমা'। এ রকম নক্ষত্রসকল যখন তাদের জ্বালানি শেষ করে জীবনকালের প্রান্তঃসীমায় এসে উপনীত হয়, তখন ভয়ঙ্কর এক সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে এদের বহিস্তরটি ভেঙ্গে-চুরে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে, আর ভিতরটা সঙ্কুচিত হয়ে শ্বেত বামনের চেয়েও ঘনতর এক ধরনের ঘনীভূত বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয়। এদেরকেই বলা হয় 'নিউট্রন তারকা'। সূর্যের চেয়ে ১.৪ গুণ ভারী সকল নক্ষত্রই যে নিউট্রন নক্ষত্রে পরিণত হয় তাও নয়। এরও একটি নির্ধারিত সীমা রয়েছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে, যে সকল তারকা সূর্য-ভরের তুলনায় ১.৪ - ৩ গুণ ভারী, শুধু এরাই নিউট্রন তারকায় পরিণত হয়। আর এর চাইতে গুরুভার নক্ষত্ররা প্রবল মাধ্যাকর্ষণের টানে ভেঙ্গে পড়তে পড়তে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যখন এদের ঘনত্ব হয়ে যায় অসীম। এসব জড়পি এমনই ঘন যে আলো এদের কাছাকাছি এলে এর প্রচ মাধ্যাকর্ষণ টানকে উপেক্ষা করে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। কোন ধরনের আলো প্রতিফলিত না হওয়ায় আক্ষরিক অর্থেই এই নভোজাগতিক বস্তুসমূহ আমাদের চোখে থেকে যায় অদৃশ্য। এরাই হলো বহুল প্রচারিত 'কৃষ্ণ গহ্বর' বা ব্ল্যাক হোল (black hole)।

এই তত্ত্ব কথাগুলো বিজ্ঞানীদের জানা ছিল অনেক আগে থেকেই। তবে প্রমাণ পেতে সময় লেগেছে। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে জোসলিন বেল আর অ্যান্টনী হিউয়িশ মহাকাশে খুঁজে পেলেন এক নতুন ধরনের তারা। সাধারণ তারার মূল উপাদান হলো হিলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। কিন্তু এ ধরনের নতুন তারার মূল উপাদান কেবল নিউট্রন। তাই এরা হলো নিউট্রন তারা (neutron star)।

নিউট্রন তারার অস্তিত্বের তত্ত্ব-কথাগুলো তো তাদের আগেই জানা ছিল। কাজেই বুঝতে তেমন অসুবিধা হলো না। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই দু'জন বিজ্ঞানী এ ধরনের নক্ষত্রের সন্ধান পেলেন কী করে? নিঃসন্দেহে এই খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারটি বেশ কষ্টকর, কারণ নিউট্রন নক্ষত্র হচ্ছে তারকার

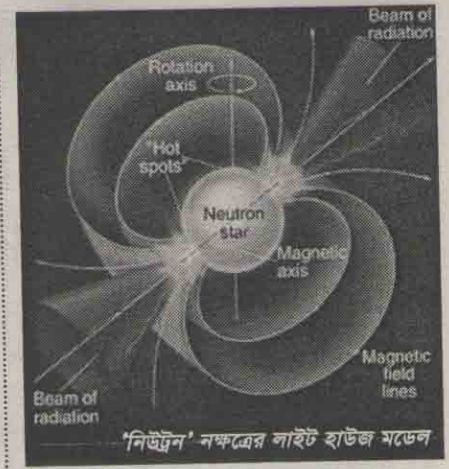


'শ্বেত বামন' নক্ষত্রের জন্য ভর-ব্যাসার্ধের সম্পর্ক



প্রায় অন্তিম দর্শা, একেবারে যাকে বলে জরাগ্রস্ত অবস্থা। এ ধরনের জরাগ্রস্ত তারকা থেকে আলোক রশ্মি নির্গত হয় না বললেই চলে। তাহলে এদেরকে চেনার উপায় কি? আসলে আলো বের না হলেও এক ধরনের বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তাড়িতচৌম্বক চেউ অর্থাৎ রেডিও বা তরঙ্গ বেরিয়ে আসে।

এই রেডিও তরঙ্গ সনাক্ত করেই নিউট্রন তারকার সন্ধান পেলেন হিউয়িশ আর বেল। নিউট্রন তারকা থেকে কিন্তু রেডিও তরঙ্গ নিরবচ্ছিন্নভাবে বিকিরিত হয় না; বরকে বরকে বেতার তরঙ্গও সঙ্কেত আকারে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়। অনেকটা সমুদ্র সৈকতে সার্চ-লাইটের মতো কিংবা আমাদের নাড়ির স্পন্দনের মত। এ ধরনের ভাঙা ভাঙা বেতার সঙ্কেতকে বলা হয় বেতার স্পন্দ বা ইংরেজিতে রেডিও পালস (radio pulse)। পালস থেকেই এই তারার নাম হয়েছে পালসার বা স্পন্দময়; বাংলা করে আমরা বলতে পারি ঝলক বা স্পন্দ তারা। এই পালসার আবিষ্কার করে, ১৯৭৪ সালে অ্যান্টনী হিউয়িশ নোবেল পুরস্কার পেলেন। কিন্তু জোসলিন বেল এই সম্মান থেকে বঞ্চিত হলেন, কেন তা বলা মুশ্কিল। অনেকের মতে, বেল ছিলেন তখন হিউয়িশের ছাত্রী, এটি বোধহয় ছিল নোবেল কমিটির কাছে একটা বড় কারণ। অনেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানীই (যেমন, Sir Frederick Hoyle, Thomas Gold, Jeremiah Ostriker) আজ মনে করেন জোসলিন বেলের প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল সে সময়। তবে বিনয়ী জোসলিন



বেল কিন্তু তা মনে করেন নি। এ প্রসঙ্গে বেলের মন্তব্য :

I believe it would demean Nobel Prizes if they were awarded to research students, except in very exceptional cases, and I do not believe this is one of them. Finally, I am not myself upset about it after all I am in good company, am I not?

নোবেল পুরস্কার প্রদানের ইতিহাসে এমন ঘটনা আরও ঘটেছে অতীতে। এছাড়া নোবেল পুরস্কার কিন্তু অনেকেই যথাসময়ে পাননি। চন্দ্রশেখরের কথাই ধরা যাক। শ্বেত বামনের ক্ষেত্রে তার বিখ্যাত সীমা আবিষ্কৃত হওয়ার পরও তাকে নোবেল পুরস্কার পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। আসলে ত্রিশের দশকে তার বিখ্যাত আবিষ্কার প্রকাশিত হলে চন্দ্রশেখর সে সময় এডিংটনের তোপের মুখে পড়েছিলেন। এডিংটন ছিলেন তখন বিলেতের সবচেয়ে নামকরা বিজ্ঞানী। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের উপর পরীক্ষা চালিয়ে উনিই এর সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এডিংটনের ধারণা ছিল যে, চন্দ্রশেখর আজো বাজে বকছেন। রাজকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানিক সোসাইটির (Royal Astronomical Society) একটি সম্মেলনে এডিংটন তো তরুণ সুব্রাহ্মণিয়ামকে রীতিমত হাস্যাস্পদ করে তুললেন। অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে দাঁড়ালো যে চন্দ্রশেখর এক সময় সবকিছু ছেড়েছুড়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমালেন। কারণ তিনি বুঝে নিয়েছিলেন এডিংটনের দেশে আর যাই হোক কোনও ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়ার আশা তার নেই। সে সময় এডিংটনের চাপে প্রভাবান্বিত বিজ্ঞানীদের অনেকেই চন্দ্রশেখরের কথা না মেনে নিলেও পরে সবাই বুঝেছিলেন যে এডিংটন নয়, চন্দ্রের তত্ত্বই ছিল সঠিক। আজ শত শত শ্বেত বামনের অস্তিত্বের কথা আমরা জেনেছি, এরা সবাই কিন্তু চন্দ্রশেখরের প্রতিষ্ঠিত সীমা মেনে চলে, একটিও ব্যতিক্রম পাওয়া যায়নি।

এবার একটু পেছনের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে কিন্তু একটি তথ্য